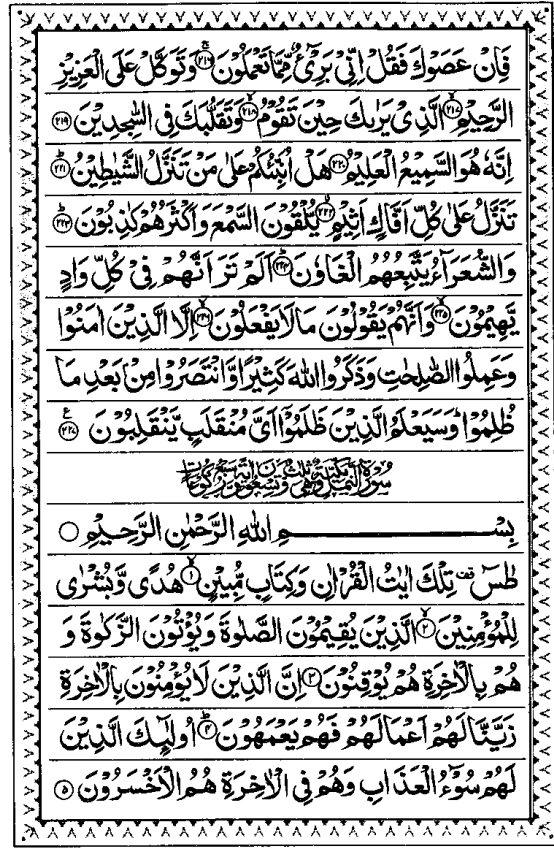


النمل ২৫

২৫৫

وقال الذين



## সূরা-নমল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ১৩

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আ-সীন; এগুলো আল-কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের। (২) মুমিনদের জন্যে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। (৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব, তারা উদবাস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তারাই পরকালে অধিকক্ষতিগ্রস্ত।

## আনুষ্ঠানিক স্মার্তব্য বিষয়

কবিতার সংজ্ঞা : وَالشُّعْرَاءُ يُبْعَثُهُمُ الْعَاوَنَ অভিধানে এমন

বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্যে ছন্দ, ওজন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে ‘কবিতাধর্মী প্রমাণ’ এবং কবিতা-দাবীযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণতঃ কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন কোন তফসীরকারক কোরআনের شَاعِرٌ تَرِيضٌ بِهِ — شَاعِرٌ مُؤْتِنٌ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে, মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার রীতি-নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলাবাহুল্য, কোরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়।

একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না। প্রাজ্ঞল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ, কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, شعر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَذِبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شَاعِرٌ বলা হয়। তাই প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعْرَاءُ يُبْعَثُهُمُ الْعَاوَنَ আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক

ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যারা ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলী রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল-বারী এক রেওয়াজে থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়াজে এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়হা, হাসসান ইবনে সাবেত, কা’ব ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবী কবি জন্মনরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরম্ভ করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আয়াতের শেষাংশে পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিক্রমীদের शामिल। এর পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথম্যাংশে মুশরেক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। — (ফতহুল-বারী)।

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথম্যাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ

তাআলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলোকে আল্লাহ তাআলা

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভুক্ত করে দিয়েছেন। কোন কোন কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে এবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়াজেতে আছে ان من الشعر لحكمة অর্থাৎ, কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।—(বোখারী) হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এই রেওয়াজেতে 'হেকমত' বলে সত্যভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বাস্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কাম্য ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়াজেতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) ওমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলতের একশ' লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) মুতারিক বলেন, আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)—এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শোনাতেন। (৪) ইমাম বোখারী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) কবিতা বলতেন। (৫) আবু ইয়াল্লা ইবনে ওমর থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গোনাহের হলে কবিতা মন্দ।—(ফতহুল বারী)

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়্যারার দশ জন জ্ঞানে-গরিমায় সেরা ফেকাহবিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সৃজনশীল কবি ছিলেন। কাযী যুবায়র ইবনে বাক্বারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী আবু আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারেন না। কেননা, ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবিগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেনি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়াজেতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর স্মরণ, এবাদত ও কোরআন থেকে গাফেল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বোখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু হোরায়রার এই রেওয়াজেতে উল্লেখ করেছেন :

لان يمتلى جوف رجل قبيحا يراه خير من ان يمتلى شعرا

অর্থাৎ, পূজ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বোখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর স্মরণ, কোরআন ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনিভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভর্বসনা, বিদ্রোপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত-বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও না-জায়েয। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম।—(কুরতুবী)

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) আমার ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমার ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়!—(কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয়, তা নিন্দনীয় : ইবনে আবী জমরাহ বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

সূরা আন-নমল,

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

زَيْنَ الْكَيْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ — অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে زَيْنَ الْكَيْدِ বলে তাদের সংকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সংকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু জালেমরা এদিকে জাফ্কেপও করেনি; বরং কুফর ও শেরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ, প্রথমতঃ সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

زَيْنَ الْكَيْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ — زَيْنَ الْكَيْدِ لِكَيْدِهِمْ وَزَيْنَ الْكَيْدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ — অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে زَيْنَ الْكَيْدِ বলে তাদের সংকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সংকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু জালেমরা এদিকে জাফ্কেপও করেনি; বরং কুফর ও শেরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ, প্রথমতঃ সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

لان يمتلى جوف رجل قبيحا يراه خير من ان يمتلى شعرا

وَأَنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ
لَأَهْلِيهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا مِنْ غَبَرٍ أَوْ نَيْلٍ مِنْ سَهَابٍ قَبِيرٍ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُ نُورُودَىٰ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ
مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ يُمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَالَّذِي عَصَاكَ فَلَئِمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
وَلَّى مُدْبِرًا ۝ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لِأَخْفَفَ إِنِّي لَأَخِيفُ لَدَىٰ
الْمُرْسَلِينَ ۝ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي
عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضًا مِنْ
حَيْبِ سُوءٍ ۝ فَنِي تَسْمِعُ آيَاتِ الْفُرْعَانِ ۝ وَفَوْمَهُ أَتَاهُمْ كَانُوا
قَوْمًا مُفْسِقِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْيَتْمَانُ مَبْرُورًا قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَوَحَدَّ وَابِهَا ۝ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ
سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ عِبَدِهِ
الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا
مَطْنُ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مَنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْبِيبِينَ ۝

(৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহর কাছ থেকে। (৭) যখন মুসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন : 'আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ পবিত্র ও মহিমাম্বিত। (৯) হে মুসা, আমি আল্লাহ, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি! অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। হে মুসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছি, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না। (১১) তবে যে বাড়াবাড়ি করে এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সংকর্ম করে। নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুস্ত্র হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়। এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। (১৪) তারা অন্যায ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? (১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সূলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, 'আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৬) সূলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোকসকল, আমাকে উজ্জ্বল পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِيهِ

মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে

স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়ঃ মুসা (আঃ) এস্থলে দু'টি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। (এক), বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। (দুই), অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তুর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবী করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ তাআলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবতঃ এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত — পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা।—(রাহুল-মা'আনী)।

এস্থলে হযরত মুসা (আঃ) كَصَطْرُونَ ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন।

অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ, শোআয়ব (আঃ)—এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্যে সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্বোধন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর পত্নীদের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং

ইশারা-ইঙ্গিতে বলা উত্তমঃ আয়াতে قَالِ مُوسَىٰ لِأَهْلِيهِ বলা হয়েছে।

اهل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও शामिल থাকে। এস্থলে মুসা (আঃ)—এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন, অন্য কেউ ছিল না, কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

فَلَمَّا جَاءَهُ نُورُودَىٰ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ

اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ يُمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ

মুসা (আঃ)—এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপঃ মুসা (আঃ)—এর এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দু'টি বাক্য চিন্তা-সাপেক্ষ — প্রথম بُورِكَ مَنْ

فِي النَّارِ এবং দ্বিতীয় إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ সূরা তোয়াহায় এই ঘটনা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়েছে — إِذْ أَنْتَ

نُودَىٰ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنِي فَكُلَّمَا نَزَلْتُكَ بِأَلْوَادِ الْمُتَكِدِّسِ

طُوى - وَأَنَا أَخْرَجْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُنُوحِي إِلَيْكَ أَنَا اللَّهُ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا

أَنَا فَاعْبُدْنِي

এসব আয়াতেও দু'টি বাক্য বিশেষভাবে চিন্তাসাপেক্ষ। প্রথম **إِنِّي** এবং দ্বিতীয় **إِنِّي** - সূরা কাসাসে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

تُوذَىٰ مِنْ شَاطِئِ الْوَالِدِ الْأَيْمَنِ فِي الْبَيْتِ الْمَبْرُكِ مِنَ  
الشَّجَرَةِ أَنْ يُؤْتَىٰ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

এই সূরাত্রয়ের বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্নরূপ হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। তা এই যে, সে রাত্রিতে একাধিক কারণে হযরত মুসা (আঃ)-এর অগ্নি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তাআলা তুর পাহাড়ের এক বৃক্ষে তাঁকে অগ্নি দেখালেন। সেই অগ্নি বা বৃক্ষ থেকে এ আওয়াজ শোনা গেল—

الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ - إِنِّي أَنَا رَبُّكَ - إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ - إِنِّي أَنَا

—এটা সম্ভবপর যে, এই আওয়াজ বার বার হয়েছে— একবার এক শব্দে এবং অন্যবার অন্য শব্দে। তফসীরে বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়ান এবং রহুল-মা'আনীতে আল্লামা আলুসী এই আওয়াজ শ্রবণের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তা এই যে; এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে একইরূপ শোনা যাচ্ছিল, যার কোন বিশেষ দিক নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর ছিল না। শ্রবণও বিচিত্র ভঙ্গিতে হয়েছে— শুধু কর্ণ নয়, বরং হাত, পা ও অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই আওয়াজ শুনছিল। এটা ছিল একটা মু'জ্জাবিশেষ।

এটা গায়বী আওয়াজ, নির্দিষ্ট কোন দিক ও অবস্থা ছাড়াই শ্রুত হচ্ছিলো, কিন্তু এর উৎপত্তিস্থল ছিল সেই অগ্নি অথবা বৃক্ষ, যা থেকে অগ্নির আকৃতি দেখানো হয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে মানুষের জন্যে নিবাস্তি ও তা প্রতিমাপূজার কারণ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক বর্ণনার সাথে সাথে তওহীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে **وَسُبِّحَ لِلَّهِ** শব্দ এই ইশিয়ারীর জন্যেই সংযুক্ত করা হয়েছে। সূরা তোয়াহায় **لَا إِلَهَ إِلَّا** এবং সূরা কাসাসে **إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ رَبُّ**

**الْعَالَمِينَ** এই বিষয়বস্তুকেই জোরদার করার জন্যে আনা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, হযরত মুসা (আঃ) তখন আগুন ও আলোর প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁকে আগুনের আকৃতি দেখানো হয়েছিল। নতুবা আগুনের সাথে অথবা বৃক্ষের সাথে আল্লাহর কলাম ও আল্লাহর সত্তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সাধারণ সৃষ্টবস্তুর ন্যায় আগুনও আল্লাহ তাআলার একটি সৃষ্টবস্তু ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে

— **أَنْ يُؤْتَىٰ مِنْ فِي النَّارِ مِنْ مَوْلَاهَا** অর্থাৎ, ধন্য সে, যে অগ্নিতে

আছে এবং যে আশেপাশে আছে। উপরোক্ত কারণেই এর তফসীরে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। তফসীরে রহুল মা'আনীতে এর বিবরণ দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে, **مَنْ فِي النَّارِ** বলে হযরত মুসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, অগ্নিটি তো সত্যিকার অগ্নি ছিল না। যে বরকতময় স্থানে মুসা (আঃ) উপস্থিত হয়েছিলেন, দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ অগ্নি মনে হচ্ছিল। তাই মুসা (আঃ) অগ্নির মধ্যে হলেন। **مَنْ مَوْلَاهَا** বলে আশেপাশে উপস্থিত ফেরেশতাসমূহকে বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে,, **مَنْ فِي النَّارِ** বলে ফেরেশতা এবং

**مَنْ مَوْلَاهَا** বলে হযরত মুসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ বোঝার জন্যে এতদুই যথেষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাসান বসরী (রাঃ)-এর একটি রেওয়াজেও ও তার পর্যালোচনা : ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুওয়াইহ্ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও সায়ীদ ইবনে জুবায়র থেকে **مَنْ فِي النَّارِ** এর তফসীর প্রসঙ্গে এই রেওয়াজেও বর্ণনা করেছেন যে, **مَنْ فِي النَّارِ** বলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পবিত্র ও মহান সত্তা বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, অগ্নি একটি সৃষ্টবস্তু এবং কোন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সৃষ্টির অনুপ্রবেশ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা আগুনের মধ্যে অনুপ্রবেশ হয়েছিল; যেমন অনেক প্রতিমাপূজারী মূশরেক প্রতিমার অস্তিত্বে আল্লাহ তাআলার সত্তার অনুপ্রবেশ বিশ্বাস করে। এটা তওহীদের ধারণার নিশ্চিত পরিপন্থী। বরং রেওয়াজেতের অর্থ আত্মপ্রকাশ করা। উদাহরণতঃ আয়নায় যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তা আয়নার মধ্যে অনুপ্রবেশ থাকে না— তা থেকে আলাদা ও বাইরে থাকে। এই আত্মপ্রকাশকে 'তাজলী' তথা জ্যোতি বিকীরণও বলা হয়। বলাবাহুল্য, এই তাজলী স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সত্তার তাজলী ছিল না নতুবা আল্লাহ তাআলার সত্তা মুসা (আঃ) অবলোকন করে থাকলে পরবর্তী সময়ে তাঁর এই আবেদনের কোন অর্থ থাকে না যে, **رَبِّ ارْنِي** **أَنْظُرْ إِلَيْكَ** হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আপন সত্তা প্রদর্শন করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এর জওয়াবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে **لَنْ تَرَانِي** বলারও কোন অর্থ থাকে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত উক্তিতে আল্লাহ তাআলার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ, অগ্নির আকারে জ্যোতি বিকীরণ বোঝানো হয়েছে। এটা যেমন অনুপ্রবেশ ছিল না, তেমনি সত্তার তাজলীও ছিল না। বরং **لَنْ تَرَانِي** উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুজগতে আল্লাহ তাআলার সত্তাপত তাজলী প্রত্যক্ষ করার শক্তি কারও নেই। এমতাবস্থায় এই আত্মপ্রকাশ ও তাজলীর অর্থ কি হবে? এর জওয়াব এই যে, এটা "মিছলী" তথা দৃষ্টান্তগত তাজলী ছিল, যা সূফী-বুয়ূর্গদের মধ্যে সুবিদিত। মানুষের পক্ষে এর স্বরূপ বোঝা কঠিন। প্রয়োজনমাত্মক কিঞ্চিৎ বোধগম্য করার জন্যে আমি আমার আরবী ভাষায় লিখিত 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থের সূরা কাসাসে এর কিছু বিবরণ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকগণ সেখানে দেখে নিতে পারেন। **إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حِسْتًا بَدَلًا سُوءًا بِرَأْيِ عَفْوٍ وَرَجِيمًا**—এর পূর্বের আয়াতে মুসা (আঃ)-এর লাঠির মু'জ্জবা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেখে মুসা (আঃ) নিজেও ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মুসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় মু'জ্জবা সূত্র হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হল এবং এটা **منقطع** - **متصل** না **استثناء** - এ সম্পর্কে তফসীরকার পণ্ডের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ একে **منقطع** সাব্যস্ত করেছেন। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে এই যে, পূর্বের আয়াতে পশুগম্বুরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, যাদের দ্বারা কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সংকর্ষ অবলম্বন করে। তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু ক্ষমার পরেও গোনাহের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে

তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে **متصل استثناء** সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহর রসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ক্রটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ, সঙ্গীরা গোনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সঙ্গীরা গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গম্বরগণের যেসব পদস্থলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীরা কবীরা কোন প্রকার গোনাহ্ নয়। তবে আকার থাকে গোনাহের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজ্জতিহাদী আস্তি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মুসা (আঃ)-এর দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদস্থলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মুসা (আঃ)-এর মধ্যে ভয়-ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্থলন না ঘটলে সাময়িক ভয়-ভীতিও হত না।—(কুরতুবী)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا — বলাবাহুল্য, এখানে পয়গম্বর-

গণের নবুওয়ত রেসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবাস্তর নয়; যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সূলায়মান (আঃ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুওয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয় — জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনদণ্ড পরিচালনা করতেন। এসব মহান নেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানরূপী নেয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নেয়ামত অন্যান্য সব নেয়ামতের উর্ধ্বে।—(কুরতুবী)

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার বোঝানো হয়েছে — আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন نحن معاشر الانبياء لا نورث অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, ورثة العلماء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم الا انبياء — অর্থাৎ, আলেমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে — আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবু আবদুল্লাহর রেওয়াজে এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সূলায়মান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী।—(কুতুব-মা'আনী) যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আঃ)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশ জন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে ভ্রাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সূলায়মান (আঃ) উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর রাজত্বও হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে

দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু, জানোয়ার ও বিহংকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবাবীর সেই রেওয়াজে ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিবারস্থ কোন কোন ইমামের বরাত দিয়ে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝাতে চেয়েছেন।—(কুতুব মা'আনী)

হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার সাতশ' বছরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বছরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সূলায়মান (আঃ)-এর বয়স পঞ্চাশ বছরের কিছু বেশী ছিল।—(কুরতুবী)

অহংকারবশতঃ না হলে নিজের জন্যে বহুবচন পদ ব্যবহার করা জায়েয : — عِلْمًا مِّنْ طَرَفِ الْكَلِمَةِ وَأَوْتَيْنَا — হযরত সূলায়মান (আঃ) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্যে বহুবচনের পদ রাজকীয় বাকপদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যে ও সূলায়মান (আঃ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্যও প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্ণর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়।—অংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যে না হয়।

বিহংকুল ও চতুর্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি-চেতনা বিদ্যমান : এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশু-পক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণ মাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফে (রহঃ) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে আতিয়া বলেন, পিপীলিকা মেধাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার দ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে ওটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। একপ করে সে শীতকালের জন্যে তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে।—(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে হুদুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَنُحْنُ الْكَلِمَةِ অর্থাৎ পক্ষীকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদুদ পাখী জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে সমস্ত পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে এস্থলে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সূলায়মান (আঃ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন না কোন উপদেশ বাক্য।

وَأَوْتَيْنَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ — আভিধানিক দিক দিয়ে كل শব্দের মধ্যে কোন বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা शामिल থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্যন্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়; যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্যশাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর কাছে ছিল না।

وَجِبْرَائِيلَ إِذْ سَلَّمَ مِنْ جُودَةٍ مِنَ الْمَعِينِ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ
حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّعْمِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِبَنَّكُمْ سَالِمِينَ وَجُودَةٌ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝
فَتَبَسَّ صَاحِبًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ ۝ وَتَقَعَّدَ
الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ هَذَا أَنَا مَكِينٌ مِمَّنْ لَا
أَعَدَّ بَنُو آدَمَ إِلَّا اذْجَبَهُ وَآيَاتُنِي بِسُلْطَنٍ
ثَبِيثٍ ۝ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ وَ
جَنَّاتٍ مِنْ سَبَائِلِنَا لَتَقِينَ ۝ إِنِّي وَجَدْتُ أُورَاقَهُمْ
وَأُوتِيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝ وَجَدْتُهَا قَوْمًا
يَجْعُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَاذُنَ لَغْوِ الشَّيْطَانِ أَعْمَامًا
فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهَمَّ لَهُمْ لَاقِعٌ وَنَازِلٌ ۝ إِلَّا السَّجُودَ لِلَّهِ
الَّذِي يَخْرُجُ الْحَبُّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

(১৭) সূলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। —  
 জ্বিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যুহে বিভক্ত  
 করা হল। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল,  
 তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে  
 প্রবেশ কর। অন্যথায় সূলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে  
 তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' (১৯) তার কথা শুনে সূলায়মান  
 মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে  
 সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ  
 করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ  
 এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সংকর্ম করতে পারি এবং আমাকে  
 নিজ অনুগ্রহে তোমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।' (২০)  
 সূলায়মান পক্ষীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, 'কি হল,  
 হৃদহৃদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত?' (২১) আমি অবশ্যই  
 তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে  
 উপযুক্ত কারণ।' (২২) কিছুক্ষণ পরেই হৃদহৃদ এসে বলল, 'আপনি যা  
 অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা'  
 থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।' (২৩) আমি এক নারীকে  
 সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে  
 এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে।' (২৪) আমি তাকে ও তার  
 সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে।  
 শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যবলী সুশোভিত করে দিয়েছে।  
 অতঃপর তাদেরকে সংপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সংপথ  
 পায় না। (২৫) তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল  
 ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন  
 কর ও যা প্রকাশ কর। (২৬) আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি  
 মহা-আরশের মালিক।'

رَبِّ أَوْزِعْنِي — এটা وزع থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত  
 রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি  
 নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না  
 হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগে  
 আয়াতের رَبِّ أَوْزِعْنِي এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বাহিনীকে  
 প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ — এখানে রোয়ার অর্থ কবুল। অর্থাৎ, হে  
 আল্লাহ, আমাকে এমন সংকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে  
 মকবুল হয়। রুহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে,  
 সংকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরী নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর  
 নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাঁদের সংকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার  
 জন্যেও দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ) কাবা  
 গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا — এতে বোঝা গেল  
 যে, কোন সংকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা  
 কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

সংকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জ্ঞান্নাতে  
 প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না : وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ  
 — সংকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ  
 তাআলার কৃপা দ্বারাই জ্ঞান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রসূলুল্লাহ  
 (সঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জ্ঞান্নাতে যাবে  
 না। সাহাবায়ে কেবাম বললেন, আপনিও কি? তিনি বললেন, হাঁ, আমিও।  
 কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহর অনুগ্রহ বেটন করে আছে।—  
 (রুহুল-মা'আনী)

হযরত সূলায়মান (আঃ)-ও এসব বাক্যে জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে  
 খোদায়ী কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করছেন অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে  
 সেই কৃপাও দান কর, যদ্বারা জ্ঞান্নাতের উপযুক্ত হই।

وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ — এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে  
 উপস্থিত ও অনুপস্থিতির খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে খোঁজ নেয়া ও  
 পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়েছে। হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ  
 তাআলা মানব, জ্বিন, জন্তু ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান  
 করেছিলেন। রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজ্ঞাদের দেখাশোনা  
 করা ও খোঁজ-খবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির  
 পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে— وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ — অর্থাৎ, সূলায়মান  
 (আঃ) তাঁর পক্ষী প্রজ্ঞাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের  
 মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এরও এই  
 সুঅভ্যাস ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেবামের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর  
 নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্যে  
 তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে  
 থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্যে জনসাধারণের এবং পীর-মুর্শীদের জন্যে শিষ্য ও  
 মুরীদদের খোঁজ-খবর নেয়া জরুরী : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত  
 হয় যে, হযরত সূলায়মান (আঃ) সর্বস্তরের প্রজ্ঞাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন

এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি, যে হৃদহৃদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম, সেই হৃদহৃদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। বরং বিশেষভাবে হৃদহৃদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হৃদহৃদ পক্ষীকুলের মধ্যে কম সংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর খেলাফতের আমলে পয়গম্বরগণের এই সুন্নতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে গুয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাতে নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যেও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে—(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের রীতি-নীতি, যা পয়গম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিশেষ শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَلِكِ لَأَرَى الْهُدَىٰ هَذَا مِمَّنْ كَانَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ — সুলায়মান (আঃ)

বললেন, আমার কি হল যে, আমি হৃদহৃদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না।

আত্মসমালোচনা : এখানে স্থান ছিল একথা বলার—“হৃদহৃদের কি হল যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই” বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, হৃদহৃদ ও অন্যান্য পক্ষীকুলের অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হৃদহৃদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবতঃ আমার কোন ক্রটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখী অর্থাৎ, হৃদহৃদ গায়ব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হল? সূক্ষী-বুয়ুর্গদেরও অভ্যাগাস তাই। তাঁরা যখন কোন নেয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্যে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্ম-সমালোচনা করেন যে, আমা দ্বারা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোন ক্রটি হল, যদ্বন্দ্ব এই নেয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাতে দিয়ে এ স্থলে বুয়ুর্গদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, إذا فقدوا أمالهم فقدوا أعمالهم, অর্থাৎ, তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ক্রটি হয়ে গেছে।

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর সুলায়মান (আঃ) বললেন, اَمَّا مِنْ التَّكْبَرِ — এখানে ام শব্দটি كِبٍ এর সমার্থবোধক।—(কুরতুবী) অর্থাৎ, হৃদহৃদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি, বরং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে হৃদহৃদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হৃদহৃদকে খোঁজার কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান (আঃ) তখন এমন জায়গায়

অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তাআলা হৃদহৃদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্ত্রসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত স্বর্ণণাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হৃদহৃদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হৃদহৃদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিলেন। তারা ক্ষিপ্ৰগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হৃদহৃদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন — ف يَأْوِفَانِ كَيْفَ يَرَى الْهُدَىٰ بِأَطْنِ الْأَرْضِ وَهُوَ لَا يَرَى الْفَنَجَ حِينَ يَقَعُ فِيهِ — জ্ঞানীগণ। এই সত্য জেনে নাও যে, হৃদহৃদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত বস্ত্রকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা কারণেও জন্যে যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তবরূপ লাভ করা অবশ্যস্বাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্ধের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারে না।

لَا تُدْرِكُهُ الْعَيْنُ وَلَا تَمْسُوهُ الْأُذُنُ وَلَا تَحِطُّ بِهِ — প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা

হচ্ছে শাসকসুলত নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জস্ত কাজে অলসতা করে, তাকে সুখম শাস্তি দেয়া জায়গে : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ তাআলা জস্তদেরকে এরূপ শাস্তি দেয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উস্মতের জন্যে জস্তদেরকে যবাই করে তাদের মাংস, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখন হালাল। এমনভাবে পালিত জস্ত গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজনমাস্কি প্রহারের সুখম শাস্তি দেয়া এখনও জায়গে। অন্যান্য জস্তকে শাস্তি দেয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ।—(কুরতুবী)

أُولَئِكَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ فِيهَا كُفْرًا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ — অর্থাৎ, হৃদহৃদ যদি তার অনুপস্থিতির

কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত গুণ পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত।

أَحْطَّتْ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ — অর্থাৎ, হৃদহৃদ তার গুণের কর্ণা প্রসঙ্গে

বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা ছিল না।

পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব ছিলেন না : ইমাম কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জানা থাকবে।

وَ جَنَّاتِكَ مِنْ سَيِّئَاتِكَ يُقَاتِرُونَ — ‘সাবা’ ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ

শহর, যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়ামনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশী? : হৃদহৃদের উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রশ্ন করেন যে, কোন শাগরেদ তার গুস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোন ব্যক্তি

আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশী—যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু রুলুল মাআনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুরুব্বীদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বজ্রনীয়। হুদহুদের উক্তি-কে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং ওযরকে জোরদার করার জন্যে এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন কথা বললে তাতে দোষ নেই।

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ — অর্থ আমি এক নারীকে পেয়েছি, সে সাবা সম্প্রদায়ের রাণী। অর্থাৎ, তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান—(কুরতুবী)। তার পিতামহ হুদহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুল-কৌলিন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়।—(কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবতঃ এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি? এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তাঁরা জিন জাতিতে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্যে হালাল কিনা? এতে ফেকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জস্ত-জানোয়ারের ন্যায় জিন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ “আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান” কিতাবে উল্লিখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই

বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়াজে সূলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সূলায়মান (আঃ)—এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্যে বাদশাহ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয কিনা? ; সহীহ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, امرأة ولوا امرهم (সাঃ) এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, امرأة ولوا امرهم (সাঃ) অর্থাৎ, যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সূলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। একথা কোন সহীহ রেওয়াজে দ্বারা প্রমাণিত নেই।

وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ سُورٍ — অর্থাৎ, কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্যে যেসব সাজ সরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিস্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকে এর পরিপন্থী নয়।

وَكُلُّهَا عُرُشٌ عَظِيمٌ — আরশের শাব্দিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকুত ও মণিমাণিক্য দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জুওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجَدَتْهُمُ قَوْمًا يَجِدُونَ لِلشَّيْئِيسِ - - এতে জানা গেল যে, বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের এবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল।—(কুরতুবী)

فَصَدَّ هُمُوعِنَ وَرَيْنَ لَأَمِّ الشَّيْطَانِ - এর সম্পর্ক অথবা অর্থাৎ, আল্লাহকে সেজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আল্লাহকে সেজদা করবে না।



(২৭) সুলায়মান বললেন, 'এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যাবাদী। (২৮) তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়।' (২৯) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। (৩০) সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই : অসীম দাতা, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু, (৩১) আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।' (৩২) বিলকীস বলল, 'হে পারিষদবর্গ, আমাকে আমার কাছে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' (৩৩) তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারাই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন।' (৩৪) সে বলল, 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। (৩৫) আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি, দেখি, প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে।' (৩৬) অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। (৩৭) ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিস্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। (৩৮) সুলায়মান বললেন, হে পারিষদবর্গ, 'তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? (৩৯) জনৈক দৈত্য-জিন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশৃঙ্খল।

লেখা এবং পত্রও সাধারণ কাজ-কারবারে শরীয়তসম্মত দলীলঃ **إِذْ هَبَّ بَيْنِي هَذَا** — হযরত সুলায়মান (আঃ) সাবার সম্রাজ্ঞীর কাছে পত্র প্রেরণকে তাঁর সাথে দলীল সম্পন্ন করার জন্যে যথেষ্ট মনে করেছেন। এতে বোঝা গেল যে, সাধারণ কাজ-কারবারে লেখা এবং পত্র ধর্তব্য প্রমাণ। যে ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য প্রমাণ জরুরী, ফেকাহবিদগণ সেক্ষেত্রে পত্রকে যথেষ্ট মনে করেননি। কেননা, পত্র, টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। সাক্ষ্যদাতা আদালতের সামনে এসে বর্ণনা করবে, এর উপরই সাক্ষ্য নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে। এ কারণেই আজকালও পৃথিবীর কোন আদালতে পত্র ও টেলিফোনের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণকে যথেষ্ট মনে করা হয় না।

কাফেরদের মজলিস হলেও সব মজলিসে মানবিক চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত : **فَأَلْقَاهُ الْيَوْمَ ثُمَّ تَوَلَّى عَصَمٌ** — হযরত সুলায়মান (আঃ) হৃদহৃদকে পত্রবাহকের দায়িত্ব দিয়ে মজলিসের এই শিষ্টাচারও শিক্ষা দিলেন যে, সম্রাজ্ঞীর হাতে পত্র অর্পণ করে মাথার উপর সওয়ার হয়ে থাকবে না; বরং সেখান থেকে কিছুটা সরে যাবে। এটাই রাজকীয় মজলিসের নিয়ম। এতে জানা গেল যে, সামাজিক শিষ্টাচার ও মানবিক চরিত্র সবার সাথেই কাম্য।

এর - **كُتِبَ** - **قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَلَيْسَ الْبُقْعِيُّ الَّذِي كَرَّمْتُمُوهُ إِذْ هَبَّ**

শাব্দিক অর্থ সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে কোন পত্রকে তখনই বলা হয়, যখন তা মোহরাক্ষিত হয়। এ কারণেই এই আয়াতে **كُتِبَ** এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদা, যুহায়র প্রমুখ

অর্থার্থ "মোহরাক্ষিত পত্র" দ্বারা করেছেন। এতে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) পত্রের উপর তাঁর মোহর অঙ্কিত করেছিলেন। আমাদের রসূল (সাঃ) যখন অনারব বাদশাহদের অভ্যাস জানতে পারলেন যে, তারা মোহরবিহীন পত্র পাঠ করে না, তখন তিনিও বাদশাহদের পত্রের জন্যে মোহর নির্মাণ করান এবং কায়সার ও কেসরার পত্রে মোহর অঙ্কিত করে দেন। এতে বোঝা গেল যে, পত্রের উপর মোহর অঙ্কিত করা প্রাপক ও স্বীয় পত্র উভয়ের প্রতি সম্মান করার নামাস্তর। আজকাল ইনভেলাপে পত্র বন্ধ করে প্রেরণ করার প্রচলন হয়ে গেছে। এটাও মোহরের বিকল্প। প্রাপকের সম্মান উদ্দেশ্যে হলে খোলা চিঠি প্রেরণ করার পরিবর্তে ইনভেলাপে পুরে প্রেরণ করা সুনুভের নিকটবর্তী।

সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র কোন ভাষায় ছিল : হযরত সুলায়মান (আঃ) আরব ছিলেন না; কিন্তু আরবী ভাষা জানা ও বোঝা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যে ক্ষেত্রে তিনি পক্ষীকূলের বুলি পর্যন্ত জানতেন, সে ক্ষেত্রে আরবী ভাষা তো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল। এটা জানা মোটেও অসম্ভব নয়। কাজেই এটা সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আঃ) আরবী ভাষায় পত্র লিখেছিলেন। কারণ, প্রাপক (বিলকীস) আরব বংশোদ্ভূত ছিল। সে পত্র পাঠ করেছিল এবং বুঝেছিল। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, সুলায়মান (আঃ) তাঁর মাতৃভাষায় পত্র লিখেছিলেন এবং বিলকীস দো'ভাষীর মাধ্যমে পত্রের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল।—(ক্লহল মা'আনী)

পত্র লেখার কতিপয় আদব : **إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسُورَاتِهِ**

কোরআন পাক মানব জীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিক নির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনা-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার সম্রাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গম্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যেও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এর পর প্রাপকের : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি সুলায়মান (আঃ) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গম্বরের সুন্যত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে এরূপ খোজাখুঁজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি محمد من عبد الله ورسوله এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, গুস্তাদ, পীর অথবা কোন মুকুব্বীর কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি? তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্ম-ধারা বিভিন্নরূপ। অধিকাংশ সাহাবী সুন্যতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রুহুল মা'আনীতে বাহুর মুহীতের বরাত দিয়ে হযরত আনাস (রাঃ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

ما كان احد اعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه اذا كتبوا اليه كتابا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمي يشهد له على ماروي .

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে আলায়ী হায়রামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রুহুল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে—বৈধতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয। ফকীহ আবুল-লাইস 'বুস্তান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বৈধতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দিধায় প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেয়াও পয়গম্বরের সুন্যত : তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ক্বারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত।

এ কারণেই হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন।— (কুরতুবী)

চিঠিপত্রে বিস্মিল্লাহ লেখা : হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গম্বরের সুন্যত। এখন বিস্মিল্লাহ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে না পারে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিস্মিল্লাহ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কোরআন পাকে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্মিল্লাহ পরে লিখিত আছে। বাহ্যতঃ এ থেকে বিস্মিল্লাহ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود الى بلقيس ابنة ذي شرح وقومها . ان لاتعلموا الخ .

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সুলায়মান (আঃ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সুলায়মান (আঃ)-এর আসল পত্রে বিস্মিল্লাহ আগে ছিল না পরে, কোরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সুলায়মান (আঃ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভেতরে বিস্মিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সুলায়মান (আঃ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ করা সুন্যতঃ **كَلِمَاتٍ يَأْتِيهَا**

الْمَلَأُوا قُلُوبِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ وَأَطِيعَةَ أَمْرًا سَخِي سَهْدُونَ

শব্দটি থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া। এখানে পরামর্শ দেয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সুলায়মান (আঃ)-এর পত্র পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য একথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তারা বলল, **عَنْ أَوْلِيَاءِ قَوْمِهِ وَأَوْلِيَاءِ سِدِّيِّ وَالْأَمْرُ لَكَ**— হযরত কাতাদা বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ—সভার সদস্য তিনশ' তের জন ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, শুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি খোদায়ী নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্যে সুন্যত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে **وَشَاوِرْهُمْ** - অর্থাৎ, আপনি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কেরামের

সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায় কেরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকীদও হয়ে যায়।

**সুলায়মান (আঃ)-এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়াঃ** রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল : হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইরূপ স্থির করল যে, সুলায়মান (আঃ)-এর কাছে কিছ উপটোকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপটোকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জরীর একাধিক সনদে হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। একথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, **وَأَنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ**

**بِهِدَايَةٍ فَظَرُّهُمُ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ** — অর্থাৎ, আমি সুলায়মান ও তাঁর

সভাসদদের কাছে কিছু উপটোকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব; যেসব দূত উপটোকন নিয়ে যাবে, তারা ফিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

**সুলায়মান (আঃ) বিলকীসের উপটোকন গ্রহণ করলেন না :**

**قَالَ أَتَيْتُكُمْ بِمِثَالِ مَا آتَيْنَا اللَّهَ خَيْرًا مِّنَّا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ بِرَبِّكَ فَتَقَرُّوهُنَّ**

— অর্থাৎ, যখন বিলকীসের দূত উপটোকন নিয়ে সুলায়মান

(আঃ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও?

আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছে, তা তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপটোকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপটোকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

**কোন কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয কিনা? :** হযরত সুলায়মান (আঃ) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপটোকন কবুল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয়। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিদ্বিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয নয়। —(রুহুল মা'আনী) হাঁ, যদি উপটোকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুনত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফেরের উপটোকন কবুল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বোখারীর টীকা 'উমদাতুল কারী'তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমের ইবনে মালেক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায় আগমন করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে দু'টি অশ্ব এবং দু'টি বস্ত্রজোড়া উপটোকন হিসেবে পেশ করল। তিনি একথা বলে তার উপটোকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপটোকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হেয়ার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপটোকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপটোকন একথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়াজেও বিদ্যমান আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন কোন মুশরিকের উপটোকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রীষ্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপটোকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়াজে উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কারও কারও উপটোকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপটোকন কবুল করেছেন। —(উমদাতুল-কারী)

বিলকীস উপটোকন প্রত্যাখ্যান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্যে মুশরিকের উপটোকন কবুল করা জায়েয নয়, বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘৃষ হিসেবে উপটোকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আঃ)-এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

**সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি :** কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়াজে বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আঃ)-এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়ে দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহর পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে হায়ির হওয়ার প্রস্ততি শুরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল-বলে আগমন করেছেন। কোন কোন রেওয়াজে আছে, যখন সে সুলায়মান (আঃ)-এর দরবার থেকে ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল, তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্মোদন করে বললেন,

**قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو الْأُكُومُ يَا بُنَيَّ بَعْرُشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُوَنِي مُسْلِمِينَ**

সুলায়মান (আঃ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি

النمل ۳۸

وقال الذين

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا الْبَرُّ بِرَبِّهِ قَبْلَ  
 أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ  
 هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ  
 شَكَرَ فَآتَيْنَاهُ أَشْكَرًا لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَيْبِي  
 غَسِيئٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَ نَكُرُوا هَٰعْرُشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ  
 مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَلِكُنَا  
 عَرُشُكَ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُرْسِنَا أَلَعَلَّمْنَا بَقِيَّتَهَا  
 وَأَنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ  
 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ  
 صَرْحٌ مُّبْدُونٌ فَوَارِيَةٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ  
 أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى  
 ثَمُودَ إِخَاهُمْ ضَلِيحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ  
 يَخْتَصِمُونَ ۝ قَالَ لِقَوْمِهِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ  
 الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ لِلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সূলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপালীল। (৪১) সূলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই? (৪২) অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি একপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহু হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহর পরিবর্তে সে যার এবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে খারগা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সূলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সূলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। (৪৫) আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। (৪৬) সালেহ বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অবল্যাপ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হবে।

ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গম্বরসুলভ মু'জেযাও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। সূলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জেযা দান করেছিলেন। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে পৌঁছার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনরূপে এখানে পৌঁছা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেয়াও সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তালা না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে পৌঁছে যাওয়া আল্লাহ তাআলার অগাধ শক্তি বলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্যে আল্লাহ তাআলার অপরিমিত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যস্বাবী ছিল যে, সূলায়মান (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

এর — مسلم শব্দটি মুসলিম — قَبْلَ أَنْ يَأْتُوَنِي مُسْلِمِينَ

বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সে হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষা থেকে তাই বোঝা যায়।

#### আনুষ্ঠানিক স্মার্তব্য বিষয়

অর্থার্থ, যার কাছে কিতাবের

জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা যে, স্বয়ং সূলায়মান (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটাই একটা মু'জেযা এবং বিলকীসকে পয়গম্বরসুলভ মু'জেযা দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সাব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সূলায়মান (আঃ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি সূলায়মান (আঃ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়াজে মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় যে, সূলায়মান (আঃ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা, এটা অবাস্তব নয় যে, সূলায়মান (আঃ) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়াকে অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশী প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন — اِكْرُمُوْا اَيُّدِيَّ

হেকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

মু'জেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জেযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

وَمَا مَيَّتْ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ - - কারামতের অবস্থাও

ছব্ব তদ্রূপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং সরাসরি আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জেযা ও কারামত—এ উভয়টিরই প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন অলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গম্বরের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জেযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়াজেত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সূলায়মান (আঃ)—এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তাঁর পয়গম্বরের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গম্বরের মু'জেযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসাররুফ : শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এর জন্যে নবী, ওলী এমন কি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সুফী বুয়ুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গম্বুরগণ তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সূলায়মান (আঃ) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক

এই তাসাররুফকে **عَلْمٌ مِنَ الْكَيْبِ** (কিতাবের জ্ঞান) - এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আযমের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

أَنَا أَنِّيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ - আমি এই সিংহাসন

চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব—আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা, কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি একাজ এত দ্রুত করে দেব।

সূলায়মান (আঃ)—এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছিল যে, সূলায়মান (আঃ)—এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উয়ায়নাকে জিজ্ঞেস করল, সূলায়মান (আঃ)—এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপার **وَأَسَلْتُ مَمْرُؤِينَ بِالْهُدُودِ الْعُلْيَا** পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব, আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সূলায়মান (আঃ)—এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সূলায়মান (আঃ) সেখানে গমন করতেন এবং তিন দিন অবস্থান করতেন। হযরত সূলায়মান (আঃ) বিলকীসের জন্যে ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন বলেও বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে।

قَالُوا الظُّلُمَاتُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩١﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٢﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٣﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٤﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٧﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٨﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قَالُوا أَظْلَمُ لَكُمْ وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١٠٠﴾

(৪৯) তারা বলল, 'তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি। সালেহ্ বললেন, 'তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর কাছে; বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াতে এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, 'তোমরা পরস্পরে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (৫১) অতঃপর, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নেস্তনাবুদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বাড়ীঘর—তাদের অশিশাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে স্ত্রী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন আছে। (৫৩) যারা বিশ্वास স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (৫৪) স্মরণ কর লুতের কথা, তিনি তাঁর কণ্ঠকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অশ্রীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ। (৫৫) তোমরা কি কামতুপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তাঁর কণ্ঠ শুধু এ কথাটিই বললো, 'লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুঘলধারে বৃষ্টি। সেই সতর্কতাদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি। (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শাস্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ্, না ওরা—তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে।

## আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تَسْعَةٌ رَهْطٌ - تسعة رَهْطٌ শব্দের অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই رَهْطٌ বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিজর জনপদের প্রধান। হিজর শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَنْبَيْتِنَا وَاهْلَهُ ثُمَّ لَقَعُوا لَوْلِيَّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاَنَا الصُّرُقُونَ

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথায় আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গোনাহ! বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্নাধিকার্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ্ (আঃ)—এর ওলী তথা দাবীদার বলেছে, সে তো সালেহ্ (আঃ)—এরই পরিবারভুক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার বাইরে কেন রাখল? জওয়াব এই যে, সম্ভবতঃ সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘবদ্ধ ছিল। সালেহ্ (আঃ) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবী করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেয়া হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

করার পর এই বাক্যে রসূলে করীম (সাঃ)—কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যাটিও লুত (আঃ)—কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে الَّذِينَ الْاَصْطَفَى বাক্যে বাহ্যতঃ পয়গম্বরগণকেই বোঝানো হয়েছে; যেমন অন্য আয়াতে وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়াজে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেলাম (রাঃ)—কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে الَّذِينَ الْاَصْطَفَى বলে সাহাবায়ে কেলামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্যে 'আলাইহিস সালাম' বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ তাআলা এ



النمل ২৫

৩৮২

امن خلق ২

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا وَنَايِبًا  
 لِنُحْرَجُونَ ۖ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَالْآبَاءُ وَنَا مِنْ  
 قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ قُلْ سِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۖ  
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَلُوبٍ مِمَّنْ يَنْسَوْنَ ۖ  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ قُلْ  
 عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي سْتَعْتَجِلُونَ ۖ  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا  
 يَشْكُرُونَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَإِنَّا  
 لَنُحِيطُونَ ۖ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي  
 كِتَابٍ مُبِينٍ ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا الْقُرْآنُ يُقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي  
 إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ وَإِنَّهُ  
 لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ  
 يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۖ  
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۖ

(৬৭) কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? (৬৮) এই ওয়াদাশ্রাব্য হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? (৭২) বলুন, অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে। (৭৬) এই কোরআন বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৭) এবং নিশ্চিতই এটা মুমিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। (৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭৯) অতএব, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।

হয়ে থাকে। এমনিভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্যে পিতাসুলভ স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের কারণে কখনও বদ-দোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজেরী হযরত আবু যর (রাঃ)-এর জবাবী রেওয়াজে করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহর উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়।—(কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কু-ধারণার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশতঃ দেরীতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার এখলাস ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগে কোন ত্রুটি আছে কিনা।

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

(সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন, জাতি ইত্যাদি—তাদের কেউ গায়বের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ—এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রসূলও শরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আনআমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

بَلْ اِذْرٰكٌ عٰلَمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ- بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ وَهْمًا عَمُوْنٌ

— اِذْرٰكٌ শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাআত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও নানা জনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন কোন তফসীরকার اِذْرٰكٌ শব্দের অর্থ নিয়েছেন تَكْمَلٌ অর্থাৎ, পরিপূর্ণ হওয়া এবং فِي الْاٰخِرَةِ -কে اِذْرٰكٌ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিষ্কৃত হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোন কোন তফসীরকারের মতে اِذْرٰكٌ শব্দের অর্থ ضَلٌ ও غَابٌ এবং فِي الْاٰخِرَةِ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি।

#### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কেয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোন যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যস্বাবী বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও ঐশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশ্বাস ও প্রামাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং কোরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী-ইসরাঈলের

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا  
 وَكُوا مُذِرِينَ ۖ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ  
 إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ ۗ وَ  
 إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ  
 تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۗ وَ  
 يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ  
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ أَلْكَابِئُومُ  
 بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُجِيبُوا بِهَا عِلْمًا مَّا دَأْبُكُمْ تَعْمَلُونَ ۗ  
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۗ  
 الْعَمِيرُوا أَكَا جَعَلْنَا الْكَيْلَ لَيْسَ كَوْنُوفِيهِ وَاللَّهُ مُبْدِي  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۗ وَيَوْمَ يُنْفَخُ  
 فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
 إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دٰخِرِينَ ۗ وَتَرَىٰ الْجِبَالَ  
 تَحْسَبُهَا جَامِدًا ۗ وَهِيَ كَمَرَمَرٍ السَّحَابِ ۗ صُغَّرَ اللَّهُ  
 الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۗ

(৮০) আপনি আহ্বান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে তাদের পঞ্চভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সংপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব, তারাই আজ্ঞাবহ। (৮২) যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না। (৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে? (৮৫) জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্বামের জন্যে এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন সিজায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। (৮৮) তুমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালার মত চলমান হবে। এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন।

আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কোরআন পাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলাবাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বোঝা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাস্তুনার জন্যে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তা নিশ্চিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র মানব জাতির প্রতি রসূলে করীম (সাঃ)-এর স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাস্তুনা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে **وَلَا تَحْزَنْ** এবং **وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ** বাক্যসমূহ এই সাস্তুনা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সাস্তুনার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্বরন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। (দুই) তাদের উদাহরণ বধিরের মত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। (তিন) তারা অন্ধের মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে:

إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ — অর্থাৎ, আপনি

তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে অণ্ডয়াজ পৌছানয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে—আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আণ্ডয়াজ পৌছানোই হত, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা, কাফেরদের কানে আণ্ডয়াজ পৌছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জ্ঞওয়ার দেয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুলও করতে চায়, তবে

এটা তাদের জন্যে উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরষখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেরই ঈমান ও সংকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে, কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা : সাহাবায়ে কেলাম (রাঃ) যেসব বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমতঃ এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়তঃ সূরা রুমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতেরের বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে :  
 وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ — অর্থাৎ, যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

উক্ত আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না ; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সে জীবন উপযোগী জীবনোপকরণও তারা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই :

وَأَنَّحَبَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فِي سِجِّيلٍ أَلْوَامًا يَلِي أَسْيَاءَ عِبَادِنَا قَوْمًا  
 يُرْزَقُونَ فِيهَا مِمَّا نَحْنُ مُنْقِضِينَ لَهُمْ مِنْ قَبْلِهَا وَيَسْتَبْرِئُونَ بِهَا لَذِينَ لَهُ  
 يَلْعَنُوا فِيهَا مِنْ حُلُقُومٍ أَلْوَامًا عَلَيْهِمْ وَآلَهُمْ جُزُؤُنَ

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্যে প্রযোজ্য—সাধারণ মৃতদের জন্যে নয়, তবে এর জগোয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কয়পক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতিও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকী থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃত ব্যক্তিরও শ্রবণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে, এই মতের প্রবক্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উরূপ ভিত্তিগীল। হাদীস এই :

ما من احد يمر بقبر اخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم

عليه الاراد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام .

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ তাআলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জগোয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জগোয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ তাআলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হল। (এক) মৃতরা শুনতে পারে এবং (দুই) তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ তাআলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জগোয়াব দেয়ার শক্তি দান করেন। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকাটা ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শোনবে কিনা। তাই ইমাম গাযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, সহীহ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা-বার্তা শোনে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়াজেতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা একসময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শোনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের কথা শোনে না, অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নমল, সূরা রুম ও সূরা ফাতেরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয় ; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশ্বাস রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে—অকাটারূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে : মুসনাদে আহমদে হযরত হযায়ফা (রাঃ)—এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত সৎঘটিত হবে না। (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধূম নির্গত হওয়া, (৩) অদ্ভুত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া, (৪) ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের আবির্ভাব হওয়া, (৫) ঈসা (আঃ)—এর অবতরণ, (৬) দাঙ্জাল, (৭) তিনটি চন্দ্র গ্রহণ—(এক) পশ্চিম, (দুই) পূর্বে এবং (তিন) আরব উপদ্বীপে ; (৮) এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে ইকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে ধেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের নিটকবর্তী সময়ে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। ۞ تنوين শব্দে—এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জঙ্ঘাটি অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মোতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না ; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কেয়ামতের

সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর আবু দাউদ তায়ালিসির বরাত দিয়ে হযরত তালহা ইবনে-ওমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্তার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মস্তকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে-হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইব্রাহীমের মাঝখানে পৌঁছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন ঠেকে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে।—(ইবনে-কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদ্ভিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদুয়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)

শায়খ জামালুদ্দীন মহল্লী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় ‘সং কাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ’—এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।—(মাহহারী) এ স্থলে ইবনে-কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াজে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিছুতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই বিশ্वास রাখা দরকার। এর অধিক জানার চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লেখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ, **أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَلْبِئُونَكَ** এই বাক্যটি সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই : অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্वास করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সে সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্वास করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্वास আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়াজে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে।—(ইবনে-কাসীর)

**فَصُرُّوْهُنَّ** এ শব্দটি **وَزَع** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেয়া। অর্থাৎ, অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ **وَزَع** শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেয়া। অর্থাৎ, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। **وَأَمْرٌ تُبْطِئُونَ بِهِ** এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ ; বিশেষতঃ যখন কেউ চিন্তা-ভাবনাও ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই

মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও তওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ, এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার আস্তিত্ব ক্ষমা করা হবে না।

--- **فَفَزَعَ - وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَنَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ** শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্ভিন্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে **فَزَع** শব্দের পরিবর্তে **صَعِقَ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে সিদ্ধার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিদ্ধার ফুৎ দেয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্ভিন্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতিবিহ্বল অবস্থায় উদ্ভিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিন বার সিদ্ধার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়ম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।—(কুরতুবী)

**إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ** উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীতিবিহ্বল হবে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না।—(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি ঝাড়া অবস্থায় আরশের চারি পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গম্বরগণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ, তাঁদের জন্যে রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুওয়তের মর্যাদাও।—(কুরতুবী)

**وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمَادًا وَرَوَى تَمُومًا السَّحَابَ** উদ্দেশ্য এই যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘ-মালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন।

**صُعْرَةُ اللَّهِ الَّتِي أَنْفَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ** - **صنع** শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা,